পঞ্চম অধ্যায়:

বিংশ শতাব্দী (প্রথমার্ধ)-এর উপন্যাস ও জাদুবিশ্বাস: পরিবর্তনের বয়ান

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এ গবেষণা সন্দর্ভটির জন্য নির্বাচন করা হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কারণ, এই সময়ের উপন্যাসে জাদুবিশ্বাস উপস্থাপনের বড় সড় পরিবর্তনটা এই তিন জনের উপন্যাসগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়। অলৌকিকতা জাদুবিশ্বাসের জগৎ ছেড়ে বিজ্ঞানবাদে উত্তরণপর্বটি বেশ মোটা দাগেই ধরা পড়েছে এঁদের উপন্যাসগুলিতে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০):

অলৌকিকতা, জাদুবিশ্বাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) সাহিত্যে বারবার এসেছে। কখনো তিনি তাঁকে পারিপার্শ্বিকের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, কখনো বা চারপাশ থেকে আলাদা করে সচেতনভাবেই তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। 'শিশুর মতোই বিভূতিভূষণ দেবযোনি, প্রেতযোনি, লোকান্তরে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। যুক্তির সিদ্ধান্তে তার অনেকখানিই গ্রাহ্য হতে পারে না।'[১] কোনো কোনো কাহিনির শেষে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে, কোথাও বা চরম ঔদ্ধত্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা পার করে তারা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে; যুক্তিবাদী পাঠকের দু' ভ্রূর মাঝের কুঞ্চনের আদৌ তোয়াক্কা করেনি।

দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫)-

‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ উপন্যাসের কাহিনি জিতুর। অদ্ভুত এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী সে। সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, এমন অনেক কিছু সে মানসচক্ষে দেখতে পায়। যেমন, খুড়তুতো বোন পাণীর মৃত্যুর সময় তার মনে হয় পাণীর দিদিমা তাকে ডাকতে এসেছে, মনিব মেজবাবুর পুত্রসন্তান জন্মাবার আগেই সে দেখে ফেলে বাড়ির উঠোনে একটি ছোটো ছেলে খেলছে। হীরু ঠাকুরের প্রেত এসে তাকে বলে যায়, তার জেঠু পাপের শাস্তি পাবে ইত্যাদি।

বাকিরা জিতুর এই অলৌকিক ক্ষমতাকে পাগলামি বলেই ঠাহর করে, মনে করিয়ে দেয় জিতুর বাবা শেষ জীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষিত যুক্তিবাদী মেজবাবু তাকে বিদ্রূপ করে।

কিন্তু ঔপন্যাসিক আগাগোড়া নিশ্চুপ থাকেন। এ প্রসঙ্গে কোনো যুক্তি দেন না, তর্কের মধ্যে দিয়েও যান না। জিতুর মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে করে এই অলৌকিক-দৃষ্টিপ্রদীপের জট ছাড়াতে গিয়ে পাঠকও খানিক এগিয়ে আর পথ খুঁজে পায় না। হীরু ঠাকুরের প্রেতের বিষয়টি জিতুর অবচেতন মনের প্রতিশোধ স্পৃহা হতে পারে, মালতীর মৃত্যুটা জানতে না পারাটাও যদি এ ব্যাপারে কিছু ইতিবাচকতার সংকেত দেয়, প্রশ্ন ওঠে পাণীর দিদিমা আর মেজবাবুর ঘটনা নিয়ে। পাণীর দিদিমাকে দেখার আগে জিতু কিন্তু দিদিমার কথা জানত না, মেজবাবুর ভাবী ছেলেকে জন্মানোর আগেভাগে খেলতে দেখলেও মেজবাবুর বৌয়ের সন্তান-সম্ভাবনা তার অজানা ছিল।

আরণ্যক (১৯৩৯)-

ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইস্‌মাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তসীমা—বিস্তীর্ণ এই অরণ্যই ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের পটভূমি। কথক সত্যচরণ বি.এ. পাশ শিক্ষিত যুবক, চাকরিসূত্রে কলকাতা থেকে এই পরিবেশে এসে পড়েছে। মূলত

স্থানীয় মানুষজনেরই বিশ্বাসের অন্দরমহল এ কাহিনিতে উঠে এসেছে। একের পর এক অলৌকিক ঘটনা তাদের অভিজ্ঞতায়।

১। উড়ুক্কু সাপ, জীবন্ত পাথর, আঁতুড়ে ছেলের হেঁটে বেড়ানো

২। বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর বন্যমহিষদের রক্ষা

৩। জীনপরী

গাঙ্গোতা জাতির গনু মাহাতোর উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন। সে রহস্যময় নানান কথা বলতো—'উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা'[২]। তার কাছেই কথক প্রথম শুনেছিলেন বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কাহিনি। দ্বিতীয়বার শুনলেন গনোরী তেওয়ারীর তাঁবুতে। রাজপুত দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা ঢোলবাজ্যা দ্বারভাঙ্গা মহারাজের রিজার্ভ ফরেস্টে বুনোমহিষ ধরতে গিয়ে টাঁড়বারোর দেখা পেয়েছিল। আর সেযাত্রায় টাঁড়বারোর সাবধানবাণীতেই মহিষরা ধরা পড়েনি, বেঁচে গিয়েছিল। —'গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও।'[৩]

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি 'ডামাবাণু' অর্থাৎ 'জীনপরী'র। বোমাইবুরু জঙ্গলে এর দেখা পেয়েছিল উপন্যাসের চার-চারজন সদস্য। প্রতিদিন রাত্রে একটি সাদা কুকুর এসে

খাটিয়ার তলায় শুত, তারপর ঘর থেকে বেরোনোর সময় সে নিত মেয়ের রূপ। হেঁটে যেতে দেখা গেলেও নরম মাটিতে তার পায়ের ছাপ পড়ত না। বিশ্বাস, এই জীনপরীরা নাকি 'মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।'[৪] কাহিনিতে তার ব্যতিক্রমও ঘটল না। রামচন্দ্র আমীন পাগল হয়ে গেলেন, আর পরবর্তী বৃদ্ধ ইজারাদারের কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের ছেলেটি মারা গেল। 'মুখে তার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া কোনো-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছে একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়াছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই হয় না, পুলিস আসিয়া কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল।'[৫] সরস্বতী কুণ্ডীতেও এই হুরীপরীদের নামার ঘটনা কাহিনিতে আছে—সেখানে 'জ্যোৎস্না রাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে।'[৬] হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং নাকি একবার এই হুরীপরীদের দেখেছিল। পরিণামস্বরূপ 'একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়।'[৭]

উল্লেখ্য, এ উপন্যাসের প্রতিটি অতিলৌকিক কাহিনি বা ঘটনার সামনে কথক অনেকাংশেই নিষ্ক্রিয়। ঔপন্যাসিকও জট ছাড়াবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি। বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে

অলৌকিকতা আরো ডানা মেলতে পারে। যেমন, টাঁড়বারোর গল্প শোনার পর কথকের অনুভূতি—'গল্প সত্য কি মিথ্যা আমার সে-সব দেখিবার আবশ্যক ছিল না, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ময় খড়্গাধারী কালপুরুষের দিকে চাহিতাম, নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথায় বনের মধ্যে বন্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল, অন্ধকার ও নিঃশব্দ আকাশ, অন্ধকার ও নিঃশব্দ পৃথিবী শীতের রাত্রে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া কি যেন কানাকানি করিতেছে—অনেক দূরে মোহনপুরা অরণ্যের কালো সীমারেখার দিকে চাহিয়া এই অশ্রুতপূর্ব বনদেবতার কথা মনে হইয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত।'[৮] 'ডামাবাণু'র ঘটনার পর তাঁর 'দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরে ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ-প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।'[৯] রাসপূর্ণিমায় সরস্বতী কুণ্ডীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর 'সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে।'[১০]

দেবযান (১৯৪৪)-

'দেবযান' উপন্যাসের কাহিনি কুড়ুলে বিনোদপুরের যতীনের—যতীনের এ জন্মের, পরজন্মের, আর দুই জন্মের মধ্যকালীন বিদেহী আত্মান্তরের। মূলত মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার উপস্থিতি ও জন্মান্তরের বিশ্বাস এ কাহিনির সবটা জুড়ে অবস্থান করছে।

এম.এ. পাশ ব্রাহ্মণ শিক্ষিত যুবক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে যখন অর্ধভুক্ত অসুস্থ অবস্থায় মারা গেল, জড়শরীর ছাড়ামাত্র সে দেখা পেল মৃত পুষ্পের—পুষ্প তার বাল্যপ্রেমের সঙ্গী। পুষ্পই তাকে আত্মার স্তরভেদ, বিদেহী জগতের নিয়মকানুন সম্পর্কে বুঝিয়ে দিল আর সাবধান করে দিল চৌম্বকক্ষেত্রের বলয় থেকে—সে পুনর্জন্মের ঢেউ। সেই পুনর্জন্মের ঢেউয়েই যতীনের আবার জন্ম হল কোলা-বলরামপুর গ্রামে। এ জন্মেও সে আশাকে স্ত্রীরূপে পেতে চায়। আশারও নতুন জন্ম হয়েছে—মুরশিদাবাদ জেলায় এক মাঝারি গোছের গেরস্থবাড়িতে। বিদেহী পুষ্প একবার করে যতীনকে দেখে যায়, একবার করে আশাকে। যে স্তরে সে আছে, সেই স্তর থেকে পৃথিবীতে যাতায়াত করা যায়। সঙ্গী যতীনকে ছেড়ে যেতে মন চায় না বলেই উচ্চতর স্তরে যাবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে সে পড়ে থাকে একই স্তরে। অভয় অর্থাৎ নতুন জন্মের ছোট্টো যতীনের মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে যায় মাঝে মাঝে। আর তখন 'অভয় ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো এক একদিন কোনো রূপসী দেবীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের মত স্নেহে তার শিয়রে বসে ঘুম পাড়াচ্চে। মায়ের মতই বলে মনে হয় তাকে।'[১১]

এ কাহিনি জুড়ে আগাগোড়া মরণোত্তর লোকের বর্ণনা, মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্ম শরীরে 'জীবিত' থাকার, পুনরায় নতুন শরীর পাবার প্রচল জাদুবিশ্বাস। ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ, অরবিন্দের 'The Life Divine' আর হেনরী বের্গসঁ-এর দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বিভূতিভূষণ এ কাহিনি লিখেছিলেন। ঔপন্যাসিকের বিশেষ বার্তা এ উপন্যাসে বয়ে নিয়ে এগিয়েছে পুষ্প—'যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েচে—সে-ই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, ভগবান তাকেই কৃপা করেচেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হলে কেউই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মানুষকে দেবত্বে নিয়ে যাবার জন্যে ঊর্ধ্বলোকে কত ব্যবস্থা, কত আগ্রহ।'[১২] বস্তুত, বিভূতিভূষণের এ উপন্যাস একেবারেই অলৌকিক-দুনিয়ার।

বিভূতিভূষণের উক্ত উপন্যাসগুলিতে জাদুচর্চার জায়গাটি নেই। আছে জাদুর কিছু তত্ত্বগত উদাহরণ। কাহিনিতে কোনো একটিরও বিরোধিতা তিনি করেননি। বরং আগাগোড়া বজায় রেখেছেন 'হতে পারে' জাতীয় মনোভাব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২):

বিভূতিভূষণের থেকে বয়সে খুব একটা ছোটো না হলেও তারাশঙ্করের লেখনী বুঝিয়ে দিল, তিনি অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক এবং আধুনিক।

ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯)-

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি মুখ্যত শিবনাথের কাহিনি। বীরভূমের অনগ্রসর কৃষিজীবী এক গ্রাম। সেখানকার সাধারণ গেরস্থ, জমিদারবাড়ির মহিলামহল, যুদ্ধ ফেরত সৈন্য, ডোম পরিবার—সমাজের নানা স্তর থেকে অসংখ্য জাদুবিশ্বাস এখানে উঠে এসেছে এখানে-

১। ভাগ্য গণনার পর ফাঁড়া কাটাতে সুলক্ষণযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ

২। কলেরা ঠেকাতে রক্ষাকালী পুজো

৩। ভূতের হাত থেকে বাঁচার জন্য রামনাম লিখে বালিশের নীচে রেখে দেওয়া

ঘোরতর বিশ্বাসী চরিত্রগুলোর আশপাশে অবিশ্বাসী চরিত্ররাও আছে—শিবনাথের মা জ্যোতির্ময়ী, শিবনাথ, শিবনাথের মাস্টার, ডাক্তারি ছাত্র শহুরে সুশীল, পূর্ণ।

শিবনাথের ফাঁড়া কাটাবার জন্য পিসিমা শৈলজা আর গোঁসাইবাবা কুষ্ঠী বিচার করে বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করলে, 'শিবুর মা বিনীত হাসি হাসিয়া বলিলেন, ... কিন্তু সংসারে কি আর কেউ কারও ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে?'[১৪] আর শিবুর 'মাস্টার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, জানেন পিসীমা, ও আমি

অনেক দেখেছি, ওতে আমি বিশ্বাস করি না। আমার একটাই ছেলে হয়েছিল, সেটা মারা গেছে। বড় মেয়েটা বিয়ের পরই বিধবা হয়েছে। অথচ কোষ্ঠীতে তার কিছু ছিল না;'[১৫]। অন্যদিকে, মহামারী কলেরা ঠেকাতে অমাবস্যায় রক্ষেকালীর পুজোর আয়োজন হল গ্রামে। 'দেবাংশী দোরে মালসা পেতে দেবে, সরষে-পোড়া ছড়িয়ে দেবে।'[১৬] বিশ্বাস—'মা আসবেন, এসে এক রেতে তেড়ে বার করবেন গাঁ থেকে। এই কি বলে গো, এই ইয়ে গাঁয়ে এক মাস কলেরা, শেষ যেদিন রক্ষেকালী পুজো হল, সেদিন রেতে পথে পথে সে কি কান্না মা! তারপর এই ভোরবেলাতে এই কালো বিভীষণ চেহারার এক মেয়ে এক চেটাই বগলে গাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।'[১৭] জনৈক দুর্গা ঠাকুরাণীর মুখে এ গল্প শুনে অবিশ্বাসী শিবনাথ হেসে প্রশ্ন করেছিল 'কে দেখেছিল?'[১৮], কিন্তু বিশ্বাসটি গ্রামের সকলের মধ্যে বেশ জোরদার। তাই রক্ষেকালী পুজোর রাতে 'একটা ভয়াতুর আবহাওয়ায় গ্রামখানা ভয়ার্ত শিশুর মত চোখ বুজিয়া কাঠের মত পড়িয়া আছে।'[১৯] শিবনাথের পরিবারও ব্যতিক্রম নয়। তাই বাড়িতে লুকিয়েই শিবনাথ, পূর্ণ আর সুশীল—তিনটে কিশোর সেদিন রাতে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়েছিল, 'একটা ভয়ঙ্কর কিছুর সহিত দেখা হওয়ার সতর্ক শঙ্কিত কৌতূহলে তাহারা ব্যগ্র উন্মুখ হইয়াছিল।'[২০]

কিন্তু তারাশঙ্করের কাহিনিতে অতিলৌকিক কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করতে পারেনি। এমন কি একদা ভূতের ভয়ে অস্থির এ কাহিনির ডোম বউটিকে দিয়েও ঔপন্যাসিক স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন—'ভূত-টুত সংসারে নেই বাবু, ওসব মিথ্যে কথা।'[২১]

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)-

প্রাচীন জাদুবিশ্বাস হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবনকে বদ্ধ জলাশয়ের মত গলা টিপে ধরেছিল। স্থবিরতার পাঁকে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছিল সমাজটা।

১। কত্তাবাবার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপকে হত্যা করতে নেই, করলে কত্তাবাবার রোষে কাহার পাড়ায় বিপর্যয় নেমে আসবে

২। কত্তাবাবার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটি মারবার পর পাপস্খালনের জন্য কত্তাবাবার পুজো

৩। নীচ জাতের ছোঁয়া খেলে জাত যায়

৪। কাহার পাড়ায় কোঠা ঘর তুললে কত্তাবাবার রোষে মৃত্যু হয়

সে অবস্থায় নতুন যুবক করালীই প্রথম আঘাত হানলো পিতৃপুরুষের সংস্কারের শেকলে। গোটা বাঁশবাদি যেখানে অজ্ঞাত উৎসের শিষধ্বনিকে কত্তাবাবার ক্রোধ বলে মনে করত, যেখানে সাপকে 'কালারুদ্দ' বা 'কত্তাবাবার বাহন' মেনে পুজো করত, করালী আগুনে পুড়িয়ে মারল সেই ভীতিকে। প্রমাণ করল শিসধ্বনিটা অলৌকিক নয়; প্রকাণ্ড চন্দ্রবোড়া সাপটার গর্জন। কত কত প্রজন্ম বেয়ে চলে আসা রহস্যের কিনারা করে সে উৎসাহের প্রাবল্যে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ডাক্ সব পাড়ার নোককে! দেখে যা তোদের কত্তা পুড়ছে।'[২২] করালীর পাপের প্রতিবিধানে কাহারপাড়ায় আয়োজিত হল অপরাধস্খালনের পুজো। সেখানে কত্তাবাবাকে তুষ্ট করতে বলিদান পর্ব। করালীর আনা হাঁস তিনটেকে কিন্তু বলির জন্য অনুমতি দিল না কত্তাবাবার অনুরক্ত কাহাররা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কত্তাবাবার প্রতি অপরাধবোধে করালী সেদিন কত্তাবাবার থানে আদৌ আসেনি। কারণ সাপ মারার পর গর্বোদ্ধত কণ্ঠে নির্ভীক যুবাটি জানিয়েছিল—'কত্তার পুজোটা সব আমাকে দিয়ো গো।'[২৩] সে এসেছিল শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষা করতে। তাই কারো অনুমতির তোয়াক্কা না করে সে নিজেই পটপট করে হাঁসের মাথাগুলো ছিঁড়ে বলেছিল—'কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।'[২৪] হীনমন্য বাকি কাহারদের মত করালী তার 'ঘোড়াগোত্ত'[২৫] 'কাহারত্ব'কে স্বীকার করেনি, সে শুধু 'মানুষ' পরিচয়েই বাঁচতে

চেয়েছিল। তাই ঘোষবাবুদের নেমন্তন্নে নিমন্ত্রিত উচ্চস্তরের লোকেদের পাত-কুড়োনো খাবার খেতে আপত্তি ছিল তার—'ছোঁয়া খেলে জাত যায় না, জাত যায় এঁটো খেলে।'[২৬] এ ভাবনা কাহারপাড়ায় নতুন, যেমন নতুন করালীর কোঠাঘরখানা। কাহারদের সংস্কার 'যা পিতিপুরুষে করে না, তা করতে নাই। সয় না। সহ্য হয় না। মানুষ মরে যায়।'[২৭] তাই কোঠাঘর করতে নেই, কারণ কাহারপাড়ায় একটাও কোঠাঘর নেই। কিন্তু ধর্মের ভয়, দেবতার আদেশ করালীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। সে স্পর্ধার সঙ্গে আইনি ও পুলিশি ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে ঘর তুলেছে। বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়'[২৮] প্রাচীন শিমুলবৃক্ষের দেবমাহাত্ম্য অগ্রাহ্য করে নির্দ্বিধায় তাতে উঠে গেছে ঝড়ের আগাম বার্তা জানতে। যদিও কুসংস্কারগ্রস্ত কাহারেরা এর জন্যেও শিউরে উঠেছে। কিন্তু কাহার সমাজের উগ্র গোঁড়ামির কাছে করালী হারেনি। 'চন্ননপুর'-এর রেললাইনের কাজে তখন কাঁচা পয়সা। কিন্তু সেখানে যেতেও কত্তাবাবার বারণ—

'জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা

ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।...

লক্ষ্মীকে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারখানা

ও-পথে যেও না মানিক কত্তাবাবার মানা।'[২৯]

সে নিষেধ পায়ে ঠেলে করালীই প্রথম চন্ননপুরে গেছে তার দল নিয়ে। দিব্যি খেয়ে পড়ে বেঁচেছে। তারপর একসময় না খেতে পেয়ে গোটা বাঁশবাদিকেই হাজির হতে হয়েছে চন্ননপুরে। জাদুবিশ্বাস দিয়ে তারা তাদের জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলো দূর করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সেইসব সংস্কারের দড়াদড়ি ছিঁড়ে বেরিয়েই প্রাণে বাঁচতে পেরেছে হাঁসুলী বাঁকের মুমূর্ষু কাহাররা।

নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৯৫২)-

এ উপন্যাসের কাহিনি সাঁতালী গ্রামের বিষ-বেদেদের। এদের সমাজে নাকি মা মনসার কৃপায় মানবী কন্যার রূপ ধরে নাগিনী কন্যারা আসে, একের পর এক।

১) নীলকণ্ঠের মতো বিষবেদে সমাজের যাবতীয় স্খলন-পতন, পাপাচার নিজের মধ্যে হরণ করে নেয় পুণ্যকর্ম দিয়ে। আজীবন পালন করে ব্রহ্মচর্য। অজস্র নিয়মের কড়া পাহারা তার জন্য।

২) মা-মনসা ভরের বিশেষ সময় তাকে জানান দেন, তাকে দিয়ে বলিয়ে নেন নানান সাবধানবাণী, আদেশ, উপদেশ।

৩) একজন বিষবেদেকন্যার থেকে দেবত্ব হরণ করার পরে আর একটি বিষবেদে কন্যার শরীরে ফুটে ওঠে নাগিনী লক্ষণ।

৪) পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে যারা সর্পাঘাতে বিধবা হয়, ষোলো বছর অবধি দ্বিতীয় বিবাহ হয় না, এবং কপালে নাগচক্র ফুটে ওঠে, তার ওপরেই মনসা কৃপা করেন।

৫) নাগিনীকন্যা অবস্থায় কামাতুর মানবীর গা থেকেও মিলনতৃষাতুর সাপিনীর মতো মিষ্টি গন্ধ বের হয়।

বেদে সমাজের সমাজপতি—শিরবেদেও নাগিনীকন্যার আদেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা রাখে না। এই শিরবেদেদের জন্য কিন্তু কোনো নিয়ম নেই, চরিত্রের যাবতীয় কলুষ মাফ—যোগ্যতা শুধু শিরবেদে-বংশের সঙ্গে সম্পর্কটুকুই। যাই হোক, এই কাহিনির সময়পর্বে দু'জন শিরবেদে ও সেই শিরবেদের আমলে দু'জন নাগিনীকন্যা—মহাদেব ও শবলা এবং গঙ্গারাম ও পিঙ্গলা।

প্রাচীন এ সমাজ যখন একটার পর একটা মানবীকে দেবী-অংশীর সম্মান দিচ্ছিল—তখন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মেয়েটি সকলের কাছ থেকেই সেই সম্মান মর্যাদা শ্রদ্ধা ভক্তি পেত। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে জাদুবিশ্বাসের ভুলটা ভাঙতে থাকল। ভক্তির ঢাকনাটা সরিয়ে বেরিয়ে আস্তে লাগল কুৎসিত লালসা। শিরবেদে আর নাগিনীকন্যা—এদের পক্ষেই জাদুর ভেতরের বাস্তবটা বোঝা সহজ ছিল—তবে দু' ক্ষেত্রেই এ

বিশ্বাসটা কাটিয়ে উঠেছিল শিরবেদে। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মত মূর্খামি তারা করেনি। জাদু-আবহটা পুরোমাত্রায় বজায় রেখে তারা চুপিচুপি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টায় ছিল। মহাদেব তাই নিঃশব্দে ক্লেদাক্ত হাত বাড়িয়েছিল শবলার দিকে। নাগিনীকন্যার ধর্ম বাঁচাতে যদি সে শবলার প্রেমিককে হত্যা করে থাকে, তবে প্রশ্ন ওঠে, কোন্ সাহসে সে নিজে নৌকায় শবলাকে ভোগ করতে চেয়েছিল? আসলে, সমস্তটাই তার ভণ্ডামি। কিন্তু দেরিতে হলেও শবলা যদিও বা রক্তমাংসের মানবী হিসেবে আত্মআবিষ্কার করতে পেরেছিল, পিঙ্গলা কিন্তু একেবারেই শিরবেদে গঙ্গারামের চালাকিটা ধরতে পারেনি। বিষবেদে-সমাজে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী নাগিনীকন্যা কামাসক্ত হয়ে পড়লে তার গা থেকে চাঁপা ফুলের গন্ধ বের হয়। নাগু ঠাকুর পিঙ্গলাকে বেদেসমাজ থেকে মুক্ত করে নিজের সঙ্গিনী করতে চেয়েছিল। আর তাতে ফুঁসে উঠেছিল গঙ্গারাম। পিঙ্গলাকে ঘিরে সেই দুই পুরুষের আস্ফালন কোনো মিথকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসজনিত নয়, আসলে পুরোপুরি নারীটিকে অধিকারজনিত। নাগু ভালোবেসে ফেলেছিল পিঙ্গলাকে। আর গঙ্গারাম ঘুরঘুর করত পিঙ্গলার শরীরটি ভোগ-দখলের জন্য। বোঝাই যাচ্ছে, নাগিনীকন্যার মাহাত্ম্যে ছিটেফোঁটা বিশ্বাস ছিল না গঙ্গারামের। অন্যত্রও তার নানা আচরণে এর স্বপক্ষে প্রমাণ জোরদার। বেদে সমাজের টিকি কিন্তু সেই প্রাচীন বিশ্বাসে বাঁধা। নাগিনীকন্যাকে কলুষিত করতে চাওয়ার শাস্তি হিসেবে তারা বেঁধে রেখেছিল নাগুকে। নাগিনীকন্যা হওয়ায় মাঝে মাঝেই 'ভর' হত পিঙ্গলার, যদিও এই ভরের ব্যাখ্যা শিবরাম কবিরাজ অন্যভাবে দিয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী দেহদৌর্বল্যই এই রোগের মূল কারণ। কিন্তু বেদে সমাজ তা মানতে নারাজ। 'ভরগ্রস্ত' অবস্থায় তারা শিবরামকে পিঙ্গলার দেহ পর্যন্ত পরীক্ষা করতে দেয়নি। যাই হোক, এই 'ভর' হওয়ার সুবিধেটুকুকে ব্যবহার করেই পিঙ্গলা সেদিন নিষ্কৃতি দিতে পেরেছিল নাগুকে—দেবী স্বয়ং তার মধ্যে এসে বেদেদের আদেশ দিয়েছিল নাগুকে বন্ধনমুক্ত করার। নাগু চলে যাবার পর নাগুর প্রতি যে কোনো মোহ তৈরি হয়নি তার প্রমাণ দিতে অনাবৃত বুকের সামনে গোখরো সাপ পর্যন্ত ধরতে হয়েছিল পিঙ্গলাকে—তার গা থেকে চাঁপার গন্ধ ছাড়লে পুরুষ সাপটি তাকে জড়িয়ে ধরবে, নয়তো দংশন, এমনটাই ছিল বিষবেদে সমাজের বিশ্বাস। সাপটি দংশন করতেই চেয়েছিল; সুতরাং মনোগত সেই সতীত্বের পরীক্ষাতেও পিঙ্গলা সদৈবীত্বে উত্তীর্ণ হল। কিন্তু এক মধ্যরাতে হঠাৎই পিঙ্গলা আবিষ্কার করল তার ঘর

জুড়ে চাঁপা গন্ধ। তার মনে পড়ল, সেদিন দেবীস্থানে শিরবেদে গঙ্গারাম একমাত্র সে গন্ধটা পেয়েছিল। পিঙ্গলার মনে এসব কোনো সন্দেহের ঢেউই তুলল না। বরং তার স্থির প্রতীতি জাগল—মানুষ যেমনই হোক না কেন, শিরবেদের আসনটির বিশেষ গুণ আছে। যার ফলে যে কেউ শিরবেদে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে যায়। তাই সকলের নাক এড়ালেও এ গন্ধ গঙ্গারামকে ঠকাতে পারেনি। প্রতিদিন রাতে পিঙ্গলার ঘরে সেই উগ্র গন্ধ। তারপর দরজা খুলে একরাতে গঙ্গারামকে ঘরের পাশে দেখতে পেয়েও পিঙ্গলা অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। জাদুবিশ্বাসের মাদকাবেশে তার দৃঢ় প্রত্যয় তার গা থেকেই গন্ধটা ছাড়ছে। তারপর ক্রোধোন্মত্ত এক আকামা সাপের সামনে বুক পেতে উন্মাদপ্রায় পিঙ্গলা আত্মহত্যা করেছে।

নাগিনীকন্যা পিঙ্গলা মরে বুঝল সে মানবী—মানবী কখনো নাগিনী হয় না—নাগিনীকন্যার মিথ ঝুটো। কারণ নাগুকে সেও ভালোবেসেছিল, প্রতি মুহূর্তে তার ফেরার জন্য সে অপেক্ষা করত। আর বিশ্বাস অনুযায়ী এক্ষেত্রেই তো তার গা থেকে চাঁপা গন্ধ বের হবার কথা। আর নাগিনীকন্যার গা থেকে চাঁপা গন্ধ ছাড়লে নাগও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাকে পাকে বেষ্টন করে ফেলবে, দংশাবে না। বিষবেদে সমাজটার নাগিনীকন্যাকেন্দ্রিক যাবতীয় জাদুবিশ্বাস দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেবার জন্য পিঙ্গলার মৃত্যুটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কাহিনির অবশিষ্ট পরিসরে অমীমাংসিত রহস্যগুলিকে একে একে জটমুক্ত করতে থাকলেন তারাশঙ্কর। নাগুঠাকুর যে বেদেনীর থেকে নাগিনীকন্যার মুক্তির খবর এনেছিল, তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেল, সে শবলা, পূর্বতন নাগিনীকন্যা। সে যাবতীয় ধাঁধার উত্তর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়েই খুঁজে ফেলেছিল। তাই পিঙ্গলার প্রতি নাগুর অনুরাগ বুঝে সে চেয়েছিল পিঙ্গলা 'নাগিনী'র মিথ্যে থেকে বেরিয়ে এসে 'মানবী'র সুখ পাক। দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন রাতে পিঙ্গলার গা থেকে বেরোনো চাঁপার গন্ধ বা শিরবেদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অলৌকিক শক্তির ঘটনাটা স্পষ্ট হয়ে গেল মৃত্যুপথযাত্রী গঙ্গারামের স্বীকারোক্তিতে—'তার পাপ দৃষ্টি পড়েছিল পিঙ্গলার উপর। কোনক্রমে তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে সে এক জটিল পন্থার আবিষ্কার করেছিল। কন্যাটির মনে সে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল, তার অঙ্গে চাঁপার গন্ধ ওঠে। কল্পনা করেছিল, এই বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পিঙলা একদিন রাতে বের হবে, নয়তো পালাতে চাইবে। পালালে সে তাকে নিয়ে পালাত। মুর্শিদাবাদে সে যেত ওষুধের

উপকরণ আনতে। সেখান থেকে সে এনেছিল চম্পকগন্ধ। নিত্য মধ্যরাত্রে সে এসে পিঙলার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সেই গন্ধের আরক ছিটিয়ে দিত।'[৩০] অর্থাৎ জাদুবিশ্বাসের এ পর্ব শেষও হয়েছে জাদুবিশ্বাস দিয়ে। মা মনসার মানস-কন্যার সাথে অন্যায় করার অপরাধেই যেন সাঁতালী সমাজে আর নাগিনী কন্যা আসেনি। অতীতের নাগিনীকন্যা শবলা এবার মানবী শবলা হয়েই বিষবেদের দলকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে মিথ্যের মিথ থেকে অনেক দূরে, বিজ্ঞানের বাস্তবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আশেপাশের জগৎ-জীবন বারে বারে উঠে এসেছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে। বস্তুত, তারাশঙ্কর উত্তর রাঢ়ের ঊষর মাটিতেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর রসসৃষ্টির উর্বরতার ফসল। মাটির সাথে সাথে মাটির মানুষগুলোকেও তুলে এনেছিলেন তিনি শিকড় সমেত। তাই তারাশঙ্করের লেখায় লোকজীবন যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে, এমনটি খুব কম জনের সৃষ্টি সম্ভারেই প্রতুল। কিন্তু শুধু এটুকু নয়, তারাশঙ্কর-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে পারে সময়ের বিশেষ এক স্বভাবধর্মকে শিল্পরূপ দেওয়া। যেহেতু সমাজের নিম্নকোটির মানুষের কথাই তাঁর কাহিনিতে মূল উপজীব্য, তাই লোক-উপাদানের প্রয়োগ তিনি খুব সচেতনভাবেই এখানে ঘটিয়েছেন। 'ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়্যালিটি' বইতে দেখিয়েছেন কেমন করে পরিবর্তনশীল অর্থনীতির প্রেক্ষিতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সাহিত্যধারা—মূলত অরিজিন্যাল মিথ বা লোকপুরাণ—পরবর্তীকালে আপেক্ষিকভাবে হারিয়ে গেলেও, উত্তরযুগের বংশধরদের মানস-উপকরণের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবহমান থাকে। উত্তর কালের অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণীবিভাজিত সমাজে স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাচ্ছল্য-শিক্ষার বিপরীত-অনুপাতে ওই আদিম সংস্কার বিরাজ করে। অর্থাৎ কিনা,

(স্বাচ্ছন্দ্য+স্বাচ্ছল্য+শিক্ষা)=১/(আদিম সংস্কার)

সুতরাং সমস্ত সমাজের নীচের সিঁড়ির মানুষেরই চেতনার বহিরঙ্গের মধ্যে ওইসব সংস্কার এবং তার-থেকে-সঞ্জাত-ভাবনা স্বভাবতই ঢের বেশি।'[১৩]

তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে বারে বারে দেখিয়েছেন, লোকবিশ্বাস জাদুবিশ্বাসকে কীভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক মনন তার যুক্তি বুদ্ধি প্রমাণ চাওয়ার স্পর্ধা দিয়ে

কোণঠাসা করে গেছে ক্রমশ। জাদু থেকে বিজ্ঞান—মানুষের বিশ্বাসের উত্তরণের সাঁকোটাই তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলোতে ধরে রাখতে চেয়েছেন মূলত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬):

অবাস্তব যে জাদুকল্পনা নিয়ে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যজগৎ গড়ে তুলেছিলেন, তারাশঙ্কর-সাহিত্যে সেই পরাবাস্তব জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে পা রাখবার সাঁকোটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) পা রাখলেন একেবারে বাস্তব দুনিয়ায়। যেখানে আত্ম বা পর—কোনো প্রতারণাই চলে না। ভণ্ডামিগুলোকে যুক্তিবুদ্ধির আতস কাঁচের নীচে ফেলে দেখিয়ে দিলেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চালগুলো—কোনোটাই অলৌকিক নয়, সমস্তটাই লৌকিক; রক্ত-মাংস, মাটি-পাথরের ধরা-ছোঁয়ার এক্তিয়ারভুক্ত অবয়বী বাস্তব।

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)-

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে যে জাদুবিশ্বাসগুলি পাই, সেগুলি হল—

১। মৃতদেহ ছুঁয়ে না থাকলে অন্য বিদেহী আত্মা সেই নিষ্প্রাণ শরীরে প্রবেশ করে

২। 'নিচু জাত'-এর মানুষ মৃতদেহ ছুঁলে মৃত ব্যক্তির আত্মার পরলোকগতি ব্যাহত হয়

৩। দেবতা হিসেবে পূজিত গাছের তলা থেকে পুতুল পাওয়ার অর্থ সন্তানলাভের প্রতি দেবতার ইঙ্গিত

৪। মড়া মানুষ বাঁচানোর চিকিৎসা

৫। জাদুক্ষমতাবিশিষ্ট মানুষ আগে থেকেই নিজের মৃত্যুর দিন বলে দিতে পারে

একেবারে শুরু থেকেই এখানে ঔপন্যাসিক তৎপর জাদুজনিত বিশ্বাসগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগোতে। তাই গাওদিয়া গ্রামের বাইরের জঙ্গলটা ঘিরে ভূতপ্রেতের বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র আমল দেননি তিনি—'গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে ইহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাতে আর

সন্দেহ নাই।'[৩১] এরপর থেকে এই কাজ তিনি সঁপে দিয়েছেন শশীকে। শশী এ কাহিনির নায়ক—কলকাতা থকে ডাক্তারি পাশ করে সে গ্রামে ফিরেছে। সেজন্য, আর অবশ্যই বন্ধু কুমুদের প্রভাবে, গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের ভয়-ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে তারটা খাপ খায় না। 'ভূতুড়ে' জঙ্গলের মধ্য একটা লোককে দাঁড়িয় থাকতে দেখে সে মাঝি গোবর্ধনের মতো আতঙ্কিত হয় না। বরং বলে, 'ভূত যদি হয় তো বেঁধে এনে পোষ মানাবো গোবর্ধন, তুই নৌকা ফেরা।'[৩২] দূরের লোকটিকে শশী ভেবেছিল পাগল আর গোবর্ধন ভেবেছিল বিদেহী আত্মা। কাছে গিয়ে দেখা গেল সেটা হারুর বজ্রস্পৃষ্ট লাশ। একার পক্ষে লাশটা বয়ে নৌকা অবধি আনা অসম্ভব, তাই 'নিচু জাত' জেনেও গোবর্ধনের সাহায্য নিয়েছিল শশী। মনে দু'টো দিক থেকে দ্বন্দ্ব থাকলেও মীমাংসাও সে তৎক্ষণাৎ করে নিয়েছিল—'পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গ কাদামাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর তার চেয়ে কি বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,—মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।'[৩৩] আত্মার মুক্তি সম্পর্কিত শশীর বিশ্বাস যেমন আজন্মলালিত অবচেতন মনের, তেমনি সচেতন মনেও ছিল সতর্কতা—'ফেরার পথে ওকে তুই আর ছুঁসনে।'[৩৪] কারণ গ্রামের কেউ সে দৃশ্য দেখে ফেললে মৃত্যুশোকের চেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত চর্চা শুরু হবে 'ছোটোজাত'-এর ছোঁয়ায় আত্মার পরলোকগতি ব্যাহত হবার আশঙ্কা নিয়ে। অপঘাতের মড়া একা আগলাতেও শশীর মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। উপরন্তু নৌকার একমাত্র আলোটাও সে গোবর্ধনের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। কিছু সময় আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটাকে মনে মনে সাজাতে গিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল, সন্ধ্যে নামার পর ওপথ দিয়ে ফিরলে অন্ধকারে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মিশে যাওয়া হারুর শরীরটাকে সে বুঝতে পারত না আর তখন তার সাদা কাপড়টার 'মানে না বুঝিয়া তাহার একটু শিহরণ জাগিত মাত্র।'[৩৫] অর্থাৎ এখানে ভূত দেখার অভিজ্ঞতার আসল অর্থটাও বুঝিয়ে দিল শশী—সেটা আসলে ভুল দেখা বা কম দেখা ব্যতীত আর কিছুই নয়। একইরকমভাবে নিঃসন্তান যামিনী কবিরাজের বৌয়ের প্রতি দেবতার ইঙ্গিতের ঘটনাও খোলসা করল সে। 'দেবধর্মী' বকুলগাছের তলায় বাচ্চা মেয়ের ফেলে যাওয়া খেলার পুতুল পরদিন সকালে ঝাঁট দিতে এসে কুড়িয়ে নেবে সেনদিদি, নিশ্চিত বিশ্বাস করবে—'এ কাজ দেবতার, এই তাঁহার ইঙ্গিত।'[৩৬] যাদব পণ্ডিতের ইচ্ছামৃত্যুর রহস্যটাও ফাঁস হয়ে যায় শশীর কাছে—সে মৃত্যু

ছিল আফিম খেয়ে পণ্ডিত-দম্পতির আত্মহত্যা। নিজের অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে ভক্তদের বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে যাদব পণ্ডিতকে মরতে হয়েছিল সেদিন। প্রসঙ্গত, যামিনী কবিরাজের মকরধ্বজ, মহাকপিলাদির চিকিৎসা, মড়া মানুষ বাঁচানোটাও যে বুজরুকি, সে কথাও ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে উপন্যাসে—'মৃতকে যামিনীর ক' লহমার জীবন দান কেহ কখনো দ্যাখে নাই।'[৩৭]

অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আগাগোড়া বিজ্ঞানবাদ। কোনোরকম জাদুবিশ্বাসকে তিনি আমল দেননি। উল্টে প্রত্যেকটি জাদুবিশ্বাসকে ভেঙে, জাদুক্ষমতার অধিকারী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ভড়ংগুলোকে ভেঙে, তিনি ভেতরের সত্যিটাকে তুলে ধরেছেন, বাস্তবটাকে নিয়ে এসেছেন।

বাংলা উপন্যাসে উপস্থাপিত জাদুবিশ্বাসের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদল ঘটে গেল এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে। বিভূতিভূষণ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, মানিক শুরু করলেন তার অনেকখানি এগিয়ে এসে। জাদুবিশ্বাসের অলৌকিক জগতের মায়া কাটিয়ে উপন্যাস এসে পৌঁছল বিজ্ঞানবাদে। মাঝের যাত্রাপথটা উঠে এল তারাশঙ্করের উপন্যাস শিল্পে।

তথ্যসূত্র:

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়),* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জুন ২০১৪, পৃ ৩৪৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩, পৃ ১৯

প্রাগুক্ত, *আরণ্যক,* পৃ ৮৭

তদেব, পৃ ৪৬

তদেব, পৃ ৪৯

তদেব, পৃ ৭৩

তদেব, পৃ ৭৩

তদেব, পৃ ৮৭

তদেব, পৃ ৪৯-৫০

তদেব, পৃ ৭৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *দেবযান,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, আশ্বিন ১৩৫১, পৃ ১৬৮

তদেব, পৃ ১৪০

সেনগুপ্ত, পল্লব। *সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের মাপকাঠি ও চারটি উপন্যাস,* তারাশঙ্কর শততম বর্ধাপন, সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ৭, ৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ১৫৯

তারাশঙ্কর রচনাবলী ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, শ্রাবণ ১৩৭৯, পৃ ৮০

তদেব, পৃ ৮৪

তদেব, পৃ ১৩৩

তদেব, পৃ ১৩৩-১৩৪

তদেব, পৃ ১৩৪

তদেব, পৃ ১৪০

তদেব, পৃ ১৪০

তদেব, পৃ ১৪৪

তারাশঙ্কর রচনাবলী ৭ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ১লা ফাল্গুন, পৃ ১৬৪

তদেব, পৃ ১৬৪

তদেব, পৃ ১৮০

তদেব, পৃ ২৮০

তদেব, পৃ ২৯৩

তদেব, পৃ ২৮৬

তদেব, পৃ ২৭৬

তদেব, পৃ ২৭৫

তারাশঙ্কর রচনাবলী ৮ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ২২ শ্রাবণ ১৩৮১, পৃ ১৭২-১৭৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *পুতুলনাচের ইতিকথা,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ ১

তদেব, পৃ ৩

তদেব, পৃ ২

তদেব, পৃ ৩

তদেব, পৃ ৬

তদেব, পৃ ১১

তদেব, পৃ ৩১